নাম: মো: ইমরান হোসেন

জন্ম তারিখ: ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : চাকুরিজীবী,
শাহাদাতের স্থান : শাহজাদপুরের রাস্তায়

শহীদের জীবনী

মো: ইমরান হোসেনের জন্ম হয়েছিল ১৯৯৫ সালে, বরিশালের কালনা গ্রামের এক নিভৃত পল্লীতে।তাঁর পিতা নজরুল ইসলাম ছিলেন গ্রামের একজন সাদাসিধে মানুষ।আর মাতা সেলিনা বেগম সামান্য উপকরণে গড়া সংসারের হাল ধরেছিলেন।সেই মেঠো পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কাঁচা বাড়িতে, অভাবের অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, ইমরানের চোখে ছিল আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন।

অভাবের ঘেরাটোপে থেকেও ইমরান ছোটবেলা থেকেই মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।গ্রামের স্কুলের সেই কিশোর একদিন সমাজকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন।তাঁর চোখে ছিল সেই তীব্র দৃষ্টিভঙ্গি, যা কেবল একজন নেতার মধ্যেই দেখা যায়।তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি শুধু নিজের জীবন নয়, সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে চেয়েছিলেন।

গ্রামের মেঠো পথে ছোটাছুটি করে বেড়ে ওঠা ইমরানের মানসিকতা ছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা।তাঁর মনে সমাজের জন্য কিছু করার ইচ্ছা দিনে দিনে আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল।অভাবের মধ্যে থেকেও তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে।একদিন তিনি নেতৃত্ব দেবেন, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনবেন।সেই গ্রামের মাটিতে জন্ম নেওয়া ইমরানের জীবন ছিল যেন অদৃষ্টের লেখা এক গল্প, যেখানে ছোট্ট ঘর থেকে বড় পৃথিবীর দিকে পা বাড়ানোর বাসনা ছিল প্রতিটি ধাপে ধাপে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, শুধু নিজের উন্নতি নয়, বরং চারপাশের মানুষদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানোর।সেই স্বপ্নই তাঁকে একদিন শহীদ ইমরান হোসেন হিসেবে পরিণত করেছিল-যিনি তাঁর আদর্শ, নীতি এবং জনগণের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ ইমরান হোসাইন ছিলেন পরিবারের একমাত্র ভরসা।তাঁর উপার্জনেই চলত তাদের সংসার।তাঁর বাবা, এক সময়ের গর্বিত সেনা কর্মকর্তা, আজ অবসরপ্রাপ্ত, বয়সের ভারে নুয়ে।জীবনের এই পর্যায়ে এসে তিনি আর সংসারের হাল ধরে রাখতে পারছেন না, আর ছেলেই ছিল তাদের শেষ অবলম্বন। ইমরানের উপার্জনে তাদের ছোট্ট সংসার চলত।তার ঘামের প্রতিটি ফোঁটা যেন পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মুখে হাসি ফোটাতো।কিন্তু আজ সেই পরিবার এক গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে।

ইমরানের চলে যাওয়ার সাথে সাথেই যেন তাদের জীবনের সব আলো নিভে গেছে।অর্থনৈতিকভাবে তারা এখন চরম দুরবস্থার মধ্যে আছে।আয়ের কোনো নতুন পথ খোলা নেই।সংসারের দৈনন্দিন খরচ, বাবা-মায়ের ওষুধের টাকা, সবকিছুই এখন এক অজানা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে আছে।যে ছেলেকে ঘিরে ছিল সব আশা, আজ তার অনুপস্থিতিতে তাদের বেঁচে থাকাটাই যেন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।ইমরানের পরিবারের এই দুর্দশা যেন নিঃশব্দে তাদের হৃদয়ের কান্না হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

নাজমুল খলিফার চোখে তখন গভীর বেদনার ছায়া, কণ্ঠে অসীম ক্ষোভ ও দুঃখের মিশ্রণ।তিনি তার প্রিয় ভাতিজা ইমরানের কথা স্মরণ করে বলেন- "ইমরান আমার তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছে।তার বাবা চাকরির কারণে তাকে আমার হাতেই রেখে গিয়েছিল।ছোটবেলা থেকেই আমি তাকে দেখাশোনা করেছি, ভালোবাসায় গড়ে তুলেছি।কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে আমাদের উপর বহুবার অত্যাচার হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে।বাড়িতে থাকা যেন তখন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।আমাদের নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না।একদিন সন্ত্রাসীরা আমাকে ঘিরে ধরে, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা আমার উপর হামলা চালায়।আমাকে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে যখম করে ফেলে।সেই দাগগুলো এখনো আমার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছি।সেই যন্ত্রণা আজও ভুলতে পারিনি।কিন্তু তখনো সন্ত্রাসের এই আগুন থেমে থাকেনি।'

নাজমুল খলিফার কণ্ঠস্বর তখন ভারী হয়ে আসে।তিনি বলেন, "আমার প্রিয় ভাতিজা ইমরানও ছিল এই সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য।একদিন তাকেও আক্রমণ করেছিল, তার প্রাণের ভয় ছিল প্রতিদিনের সঙ্গী।তাই, তার জীবন বাঁচাতে আমি তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।ভেবেছিলাম, গ্রাম থেকে দূরে থাকলে অন্তত সে নিরাপদ থাকবে।কিন্তু সেই আশা বাস্তবায়িত হলো না।যাদের ভয়ে তাকে গ্রামে রাখতে পারিনি, সেই হাসিনার সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঢাকায় গিয়ে আমার ভাতিজাকে মেরে ফেলল।তার প্রাণ কেড়ে নিলো।'

নাজমুল খলিফার চোখে তখন আগুনের মতো ক্ষোভ জ্বলে ওঠে।তিনি উচ্চারণ করেন, "এই নির্মম স্বৈরাচারী হাসিনা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিলো না। আমার ভাতিজার জীবন রক্ষাও করতে দিলো না।আজ আমরা ন্যায়বিচার চাই, আমরা এই হত্যার বিচার চাই।আমরা হাসিনার ফাঁসি চাই! যে জীবন আমার ভাতিজাকে বাঁচতে দিলো না, সেই জীবন যেন আজ ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ে শেষ হয়।'

যেভাবে শাহাদাত বরণ করলেন: মো: ইমরান হোসেন, ঢাকার শাহজাদপুরের এক সাধারণ মানুষ, যিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দাঁড়িয়েছিলেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, দেশের বুকে বৈষম্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলনের দাবানল ফুঁসে উঠেছিল।ইমরান ছিলেন সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরদের মধ্যে একজন।তিনি নিজের স্বপ্ন, ছোট সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য রাস্তায় নেমে আসেন।ঢাকার শাহজাদপুরের রাস্তায় সেই আন্দোলন ছিল উত্তাল।নির্যাতিত মানুষের আহ্বান, সমাজের অসমতার বিরুদ্ধে উঠে আসা সেই জনস্রোতে ইমরানও ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।কিন্তু সরকারের নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা কখনোই সহ্য করেনি এই সংগ্রামকে।একদিন যখন তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছিলেন।তখন পুলিশের গুলিতে

তিনি আহত হন।রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে তাঁর দেহ।ঘটনাস্থলেই শহীদ হোন ইমরান হোসেন।

ইমরানের ছোট সন্তান তখন ঘরে অপেক্ষা করছিল।বাবার প্রত্যাবর্তনের আশায় শিশুটি প্রতীক্ষায় ছিল।জানত না যে তার বাবা আর কখনো ফিরে আসবেন না। ইমরান হোসেনের সেই শহীদত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কীভাবে একজন মানুষ নিজের পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে বৃহত্তর মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করে যান।তার রক্তে সিক্ত হয়েছে দেশের মাটি, কিন্তু তাঁর আদর্শ আজও বেঁচে আছে।একটি সমাজ যেখানে কোনো বৈষম্য নেই, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান অধিকারে বাঁচতে পারবে।ইমরানের শহীদত্ব ছিল সেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের এক অন্যতম মাইলফলক, যা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিবারের শেষ সম্বলটুকুও শেষ

বাবা কে বাবা ডাকার আগে এতিম হয়ে গেল ইমরান হোসেনের ছেলে।যখনই সন্তান আসে তখন সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যেয়ে সে সন্তানকে নিয়েই তার স্বপ্নের সকল বীজ বুনতে শুরু করে।তাকে বড় করবে, স্কুলে যাবে করবে, তার সাথে গল্প করবে, নিত্য নতুন বায়না ধরবে, বাবার সাথে খুনসুটি করবে, তার সাথে রাগ করবে বাবা, তার রাগ ভাঙ্গাবে তাকে নিয়ে ঘুরতে যাবে, সেই বাবাই যদি এখন না থাকে তাহলে সে তা কি চাবে? দেখবে।বাবাই তো নেই, বাবা বলে ডাকবেই বা কাকে, চিনবেই তো না বুঝার আগেই বাবা তো চলে গেলেন।যখন ইয়াস খলিফা জিজ্ঞেস করবে মা আমার বাবা কোথায় সে আসে না কেন? আমার বন্ধুদের দেখি সে তার বাবাদেরকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে কত কিছু কিনছে কিন্তু আমি তো আমার বাবাকে আজও দেখলাম না আমার বাবাকে আসবে আমার কাছে।তখন তার মা কি জবাব দিবে তাকে? কিন্তু যখন জানবে তার বাবা দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে।

ইয়াস খলিফা–একটা নাম, যেটা হয়তো জীবনের শুরুতেই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে গেছে।বাবাকে "বাবা" ডাকার আগেই সে এতিম হলো।পৃথিবীতে যেই ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুটি বাবার ভালোবাসার স্বাদই পেল না, তার জন্য এই দুঃখ যেন সীমাহীন।ইমরান হোসেন একজন আদর্শিক বাবা, যিনি সন্তান জন্মানোর পরই সব দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুন স্বপ্নের বীজ বুনতে শুরু করেছিলেন।সেই স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার ছেলে ইয়াস।তিনি ভাবতেন, সন্তানকে বড় করবেন, স্কুলে পাঠাবেন, তার সাথে গল্প করবেন, তার নিত্য নতুন বায়নাগুলো পূরণ করবেন।সন্তানের সাথে হাসবেন, খেলবেন, হয়তো কখনো রাগ করবেন, কিন্তু পরে নিজেই রাগ ভাঙাবেন।কিন্তু সেই সব স্বপ্নগুলো আজও পূর্ণতা পেল না।বাবা তো আর ফিরে এলেন না।

একদিন ইয়াস যখন তার মায়ের কাছে জানতে চাইবে, "মা, আমার বাবা কোথায়? সে তো কখনো আসে না, আমার বন্ধুদের দেখি বাবাদের সঙ্গে বাজারে যায়, কতকিছু কেনে! কিন্তু আমার বাবাকে তো আজও দেখি না।আমার বাবা কি আমার কাছে আসবে না?" তখন তার মা কি উত্তর দেবে? মায়ের সেই উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতিটা সবচেয়ে কষ্টের।হয়তো সে বলবে, "তোমার বাবা আর আসবে না, বাবা তো চলে গেছে।' কিন্তু সেই উত্তর কি তার কষ্ট দূর করতে পারবে? হয়তো না।কিন্তু একদিন যখন ইয়াস বুঝবে যে তার বাবা শুধু তার জন্য নয়, বরং পুরো জাতির জন্য, পুরো দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।তখন হয়তো তার বুকভরা গর্বের একটা স্পর্শ পাবে।ইমরান হোসেন শুধুমাত্র একজন বাবা ছিলেন না।তিনি ছিলেন একজন মুক্তিকামী যোদ্ধা, একজন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সৈনিক।১৬ জুলাই, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, ইমরান ঘরে বসে থাকতে পারলেন না।দেশের এই ন্যায্য আন্দোলনে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।তার হৃদয়ে ছিল আগুন দেশকে স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে।তবে আরেকদিকে ছিল তার সদ্যোজাত সন্তান, ছোট্ট নিষ্পাপ ইয়াস।একদিকে আন্দোলন, অন্যদিকে সন্তানের ভবিষ্যৎ–এই দ্বন্দ্ব তার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।কিন্তু ইমরান জানতেন, যদি আজ এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়, তাহলে তার সন্তানের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে যাবে।তিনি চিন্তা করলেন, "আমি যদি এখন লড়াই না করি, তবে সন্তানকে কী ভবিষ্যৎ দেব? কিভাবে তার সামনে দাঁড়াব?"

এই চিন্তা তাকে পথে টেনে নিয়ে যায়।তিনি রাজপথে নামলেন, বুকে অটল সাহস নিয়ে, ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করতে।কিন্তু সেই যুদ্ধে তিনি ফিরে এলেন না। শাহজাদপুরের রাস্তায় পুলিশি গুলিতে তার শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।ইমরান তখন গিয়েছিলেন সন্তানের জন্য ওষুধ কিনতে, কিন্তু আর ফিরতে পারলেন না। পরিবারের মানুষজন যখন তার নিথর দেহ খুঁজে পায়, তখন তাদের কান্না থামানোর মতো কোনো ভাষা ছিল না।ইমরানের সেই ছোট্ট সন্তান ইয়াস এখন জানবে, তার বাবা শুধুমাত্র একজন পরিবার প্রধান ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুক্তিকামী শহীদ।তার বাবা আর ফিরে আসবেন না, তাকে "বাবা" বলে ডাকাও হয়তো আর কখনো সম্ভব হবে না, কিন্তু পুরো দেশের মানুষ ইমরানের ত্যাগের কারণে আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছে, স্বাধীনভাবে বেঁচে আছে।শহীদ ইমরান হোসেন আজও বেঁচে আছেন তার ত্যাগের মধ্য দিয়ে, আর তার সন্তানের মনে থেকে যাবে বাবার এই মহৎ আত্মত্যাগের গর্ব।

প্রস্তাবনাসমূহ: ১) ইমরান হোসেনের এতিম সন্তানের জন্য ভরণ
পোষনের সকল ব্যবস্থা করা।
২) ইমরান হোসেনের বাবার জন্য কোন ব্যবসা
প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

এক নজরে শহীদ মো: ইমরান হোসেন
নাম : মো: ইমরান হোসেন
জন্ম তারিখ : ২০/১২/১৯৯৫
পেশা : চাকুরিজীবী, একটি আবাসন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতেন
স্থায়ী ঠিকানা : কালনা, হাজিপাড়া,গৌড়নদী, বরিশাল
পিতা : মো নজরুল ইসলাম, বয়স-৬১
পেশা : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা
মাতা : সেলিনা বেগম, বয়স-৫৫
পেশা : গৃহিনী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৪ জন
ইয়াস খলিফা, বয়স : ২
ঘটনার স্থান : বাড্ডা শাহাজাদপুর, ঢাকা, বিকাল ৫টায়
আক্রমণকারী : ঘাতক পুলিশ
শাহাদাতের তারিখ : ১৯/০৭/২৪

কবরস্থান : পারিবারিক করস্থানে দাফন করা হয়েছে।